ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ

■ নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

ভাষা দিবস বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বের মানুষের কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিবস পালনের ইতিহাস যতটা চমকপ্রদ ততটাই মর্মন্তুদ। দেশভাগের পরে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরেই ঢাকায় ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে কিছু আন্দোলন হয় কিন্তু ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী যে আন্দোলন হয় ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

এখানে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম মুখ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা উল্লেখ করব। খ্যাতনামা উকিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় অনেক বাঙালির সঙ্গে একজোট হয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অন্যান্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ময়মনসিংহ জেলা থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ সালে প্রথমবারের মতো বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধর্মীয় ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি এবং ভারত ভাগের দৃঢ় বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে বাংলার বিভাজন অনিবার্য এবং তাঁর নিজ জেলা কুমিল্লা নতুন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে থাকবে, তখন তিনি পূর্ব বাংলায় থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সমসাময়িক অন্যান্য অনেক হিন্দু নেতাও সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এভাবে ভাবতে পারেননি। পরে পাকিস্তানের আইন কাঠামোর খসড়া তৈরির উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক কমিটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের একজন হিন্দু সদস্য হিসেবে তাঁর নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন (ধর্ম অনুসারে আসন বরাদ্দ করা হতো)। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম সরকারি ভাষা করার আহ্বান জানিয়ে একটি বক্তৃতা দেন, যা বাংলা ভাষাভাষিদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একথা অনস্বীকার্য যে এই স্মরণীয় বক্তৃতাটি ভাষা আন্দোলনকারীদের মানসিক শক্তি জোগানোর কাজে সর্বাংশে সফল হয়েছিল।

বলতে পারা যায় যে এইখান থেকেই শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্ব।

দেশভাগের পর পাকিস্তান নামে দুই ভূখণ্ডের জন্ম হয়েছিল, একটি পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। মানুষের মুখের ভাষার নিরিখে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান ভাষা ছিল উর্দু এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে উর্দু ভাষাকে ঘোষণা করলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একই নিয়ম চালু হয়। রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা বা বলা ভাল গায়ের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদেই শুরু হয়ে যায় ভাষা আন্দোলন।

ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কোনও জাতিকে অন্য একটি অচেনা ভাষায় পারদর্শী হতে গেলে অর্ধ শতাব্দী সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেদিন এই কথা মাথায় রেখে কোনও বাঙালি বিদ্রোহ করেনি। শুধুমাত্র মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে তারা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তাদের বিদ্রোহ থামেনি।

ওইদিন সকালে অর্থাৎ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেন। তারপর বিক্ষোভকারীরা রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাঁদের ওপর গুলি চালায়। এতে আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম এবং রফিক উদ্দিন আহমেদসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রযুবা নিহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক নাগরিক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। কারফিউ জারি হয়। কারফিউ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী সহ অগণিত সাধারণ মানুষ সমবেত হন। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি অজস্র সাধারণ মানুষ এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারী পুনরায় রাজপথে নেমে আসেন। তাঁরা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহিদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজা বা শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা-শহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য এক রাতের মধ্যে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা তৎকালীন পাকিস্তান সরকার অতি দ্রুত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। তবে বলাই বাহুল্য যে একুশে ফেব্রুয়ারীর এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়েছিল।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৭ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত ও কার্যকর হওয়ার সময় সংবিধানের ২১৪(১) ধারা অনুসারে বাংলা ভাষাকে উর্দু ভাষার সঙ্গে সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়। জয় হয় ভাষা আন্দোলনের।

পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরের দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আন্নানের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সে সময় জাতিসংঘের মহাসচিবের অধীনে কর্মরত তথ্য বিষয়ক পদাধিকারী হাসান ফেরদৌসের নজরে এ চিঠিটি আসে। তিনি রফিককে অনুরোধ করেন যে রফিক যেন জাতিসংঘের অন্য কোনও সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে একই ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করেন। পরে রফিক, আবদুস সালামকে সঙ্গে নিয়ে 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। তাঁরা পুনরায় কোফি আন্নানকে 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড'-এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি লেখেন, এবং চিঠির একটি কপি ইউএনও-র কানাডীয় দূত ডেভিড ফাওলারের কাছেও পাঠিয়ে দেন।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ও এতে ১৮৮টি দেশ সমর্থন জানায়। এর পরেই একুশে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলিতেও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।

২০১০ সালের ২১ অক্টোবর তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে স্থির হয় যে এখন থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হবে। জাতিসংঘে এই বিষয়ক একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী আজ আর একটি তারিখ নয় বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে। দুই বাংলায় বিশেষত ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনটিতে বিশেষ অনুষ্ঠান সূচির আয়োজন করা হয়। আপামর জনসাধারণ সহ লেখক কবি শিল্পী বুদ্ধিজীবী সকলেই শহিদ মিনারের সামনে ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য সমবেত হন। প্রভাতফেরি বের করা হয়। আগেই বলেছি যে ছাত্রদের দ্বারা অতি দ্রুতগতিতে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনারটি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভেঙে দিয়েছিল। বর্তমানে আমরা যে শহিদ মিনারটি দেখছি, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী। এই শহিদ মিনারের স্থপতি ছিলেন হামিদুর রহমান। ১৯৫৭ সালে নভেরা আহমেদ ও হামিদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে চূড়ান্ত নকশা তৈরি হয় এবং শুরু করা হয় শহিদ মিনারের নির্মাণ কাজ।

এরপর ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা শহিদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন।

সেই থেকে এখনও ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে গৌরবের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার; বাঙালি জাতির কাছে উজ্জ্বল করে রেখেছে ভাষা আন্দোলনের গৌরব।

প্রত্যেক বছর এই সময় ঢাকায় আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সারা পৃথিবী থেকে লোকসঙ্গীত শিল্পীরা আসেন ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সুন্দর এক পরিমণ্ডলে হাজার হাজার দর্শকের সামনে নানাবিধ অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়। এই অভিরাম সময়ের সাক্ষী হতে এই সময় সারা বিশ্ব থেকে বাংলাদেশে মানুষ আসেন। পশ্চিমবঙ্গেও নানা অনুষ্ঠান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের স্মরণ করা হয়। আয়োজিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বহু কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হয় সেই অবিস্মরণীয় পংক্তিটি—

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কী ভুলিতে পারি?'

একুশে ফেব্রুয়ারীর লেখা শেষ করব ভাষা দিবসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা আল মাহমুদের এই কবিতাটি দিয়ে—

একুশের কবিতা

আল মাহমুদ

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতের রক্ত।
হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!
প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।
চিনতে না কি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?
পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারির শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নী।
প্রভাতফেরী, প্রভাতফেরী
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে।

পুস্তক পর্যালোচনা

ইংরেজিতে লেখা কম্পিউটার বিষয়ক গ্রন্থ

'অবজেক্ট ডিটেক্শন ইন্ অ্যাডভারসারিয়াল্ ভিশন'

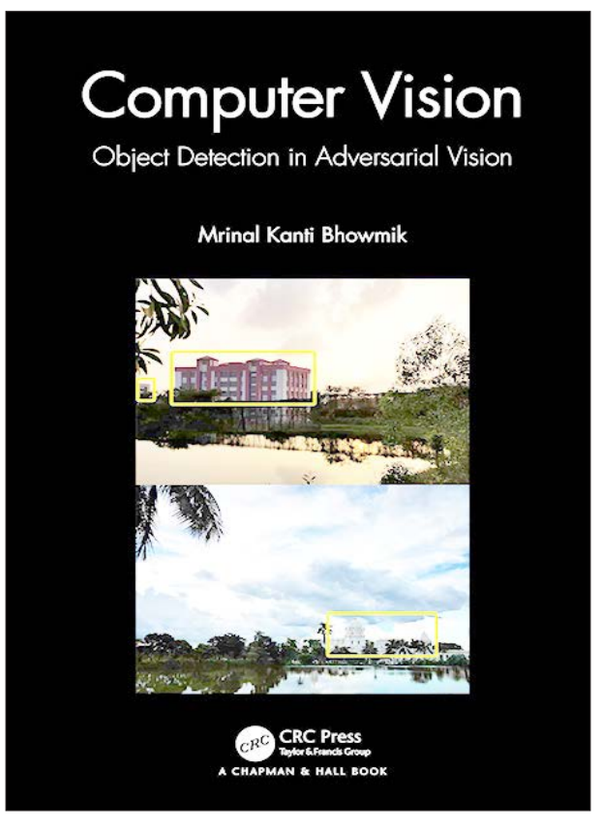

■ পূজা দাস, জাগৃতা পাল

সম্প্রতি, অধ্যাপক মৃণাল কান্তি ভৌমিকের, 'কম্পিউটার ভিশন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক মৃণাল কান্তি ভৌমিক ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রধান এবং তিনি ২০২৩-২০২৪ সালে DST-SERB ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স ফেলোশিপের মাধ্যমে এন. ওয়ায়. ইউ সেন্টার ফর সাইবারসিকিউরিটি (CCS), ট্যান্ডন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এটি একটি কম্পিউটার ভিত্তিক বিজ্ঞান নির্ভর গ্রন্থ।

এই খণ্ডটি মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। এই গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ভিজ্যুয়াল, সিসিটিভি এবং ইনফ্রারেড সম্পর্কিত আলোচনা। এখানে বস্তু শনাক্তকরণ, অবক্ষয়, সেন্সরের বিভিন্ন প্রকারের মৌলিক বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি অধ্যায় ৪ থেকে ৬ নিয়ে গঠিত: বস্তু শনাক্তকরণের জন্য বাস্তব সময়ের বেঞ্চমার্ক ডেটাসেট, শিল্পকর্মের পটভূমি এবং বিভিন্ন বস্তু কল্পনার ওপর এর প্রভাব এবং অবনমিত দৃশ্যের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি বিষয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে রয়েছে: বিভিন্ন অবস্থার অধীনে বস্তু শনাক্তকরণের কাজ এবং বিভিন্ন হ্যান্ডস-অন দৃষ্টি-ভিত্তিক কৌশলগুলিতে বস্তু শনাক্তকরণে ব্যবহারিক সমস্যা।

লেখক গ্রন্থটিকে মূলত আটটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। সর্ব প্রথমে বস্তু শনাক্তকরণের মৌলিক বিষয়গুলির অন্বেষণ দিয়ে শুরু হয়েছে। বস্তু শনাক্তকরণের গুরুত্ব হল ছবি বা ভিডিওগুলির মধ্যে বস্তুগুলিকে চিনতে এবং ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। এখনকার প্রজন্মে, স্বয়ংক্রিয়তা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবহণের জন্যে অসংখ্য শিল্পে বস্তু শনাক্তকরণ অত্যন্ত কার্যকর। বস্তু শনাক্তকরণের অভিধানগুলির মধ্যে রয়েছে স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন, যেখানে এটি পথচারী এবং বাধা শনাক্ত করতে সহায়তা করে; নিরাপত্তা এবং প্রমাণীকরণের জন্য মুখের স্বীকৃতিতে সহায়তা করে; ও মেডিকেল ইমেজিং, রোগ শনাক্তকরণে সহায়তা করে। মূলতভাবে, বস্তু শনাক্তকরণের নজরদারি পদ্ধতি এবং খুচরা বিশ্লেষণ, গ্রাহকের অভিজ্ঞতা এবং কর্মক্ষম দক্ষতা বৃদ্ধিতে একটি মূল ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, চিত্র অবক্ষয়ের একটি গভীর অনুসন্ধান প্রদান করে, এর পটভূমি, সংজ্ঞা, অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া এবং বস্তু শনাক্তকরণের ওপর-এর প্রভাবকে ব্যক্ত করে। এই অধ্যায়টি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে অবক্ষয়, বস্তু শনাক্তকরণ সিস্টেমের গুণমান এবং নির্ভুলতাকে প্রভাবিত করে, বিভিন্ন কারণের সন্ধান করে যা চিত্রের অবনতিতে অবদান রাখে এবং কীভাবে এটি অবক্ষয়িত বস্তুগুলিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে দুর্বল করতে সাহায্য করে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ইমেজ পদ্ধতি এবং বস্তু শনাক্তকরণের জন্য বাস্তব সময়ের বেঞ্চমার্ক ডেটাসেটের উপর অধিশ্রয় করে। তৃতীয় অধ্যায়ে, বস্তু শনাক্তকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের চিত্রের পদ্ধতিগুলি পরীক্ষা করে তাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং অভিধানগুলিকে লক্ষণীয় করে। চতুর্থ অধ্যায় বাস্তব সময়ের বেঞ্চমার্ক ডেটাসেটগুলি নিয়ে আলোচনা করে, যা বস্তু শনাক্তকরণ কলনবিধিগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন বাস্তব বিশ্বের পরিস্থিতিতে মডেলের নির্ভুলতা এবং দক্ষতা তুলনা করার জন্য একটি প্রমিত কাঠামো প্রদান করে।

অধ্যায় পাঁচ, ছয়, এবং সাত প্রাথমিকভাবে বস্তু কল্পনার উপর শিল্পকর্মের প্রভাবকে সম্বোধন করে, শিল্পকর্মের পটভূমি, বস্তু অধিক্রমণ, ছদ্মবেশ প্রভাব (রণ সম্ভার লুকিয়ে রাখার কৌশল) এবং আরও অনেক মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এই অধ্যায়গুলি কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন মেট্রিক্স সহ অবনতি দৃষ্টিতে দৃশ্যমানতা পুনরুদ্ধার এবং চিত্র বর্ধনের মৌলিক বিষয়গুলিকে-ও উপস্থাপন করে।

কখনও ভেবে দেখেছেন যে কীভাবে একটি বস্তুকে ক্ষয়প্রাপ্ত দৃষ্টিতে শনাক্ত করা যায়? বস্তু শনাক্তকরণের জন্য পটভূমি মডেলিং ভিত্তিক পন্থা কী? তদুপরি, অধ্যায় সপ্তম-এ বস্তু শনাক্তকরণের জন্য শাস্ত্রীয় পদ্ধতিগুলিকে অধ্যয়ন করা রয়েছে কীভাবে আবদ্ধ বাক্স পদ্ধতির উপর অধিশ্রয় করা হয়, এইসব বিষয়ে বর্ণনা করা আছে।

সর্বশেষে, অষ্টম অধ্যায়ে, অবক্ষয়িত দৃষ্টিতে বস্তু শনাক্তকরণের জন্য হ্যান্ডস-অন পন্থাগুলিকে কভার করে। বিভিন্ন ডিপ লার্নিং কলনবিধির বিবরণ দেয় এবং পাইথন অ্যাপ্লিকেশনগুলির ফোকাস সহ এর কৌশলগুলি বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহারিক পদ্ধতি সরবরাহ করে। এই অধ্যায়টি বাস্তব-বিশ্বের অভিধান-এর ওপর জোর দেয়, পাঠকদের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যে কীভাবে ডিপ লার্নিং মডেলগুলি অবক্ষয়িত চাক্ষুষ পরিস্থিতিতে বস্তু শনাক্তকরণের চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করা যেতে পারে।

অবজেক্ট ডিটেক্শন ইন্ অ্যাডভারসারিয়াল্ ভিশন
মৃণাল কান্তি ভৌমিক
সি আর্ সি প্রেস্
টেইলর এন্ড ফ্রান্সিস গ্রুপ
এ চ্যাপম্যান এন্ড হল বুক
৬০০০ ব্রোকেন সাউন্ড পার্কওয়ে
নর্থ-ওয়েস্ট, সুইট ৩০০, বোকা রেটন, এফএল ৩৩৪৮৭
মূল্য: ১৫০ পাউন্ড

(বিশ্লেষকদ্বয় ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিভাগের বিদ্যার্থী গবেষক)

• ক বি তা •

বর্ণমালা মুখস্থ নেই

চিরশ্রী দেবনাথ

আমার ভাষা চুপ হয়ে গেছে অভিমানে

সামনে দাঁড়িয়ে কিছু নির্বোধ প্রহরী,
সেমিনার, বক্তৃতা, মাল্যদান এবং টি ব্রেক

ভাষা হারিয়েছে মাটির শরীর, চোখের জল

আমি চারলাইন লিখে কেটে দিয়েছি,
রক্তপাত হয়নি, ধীরে ধীরে মুছে গেছে মায়ের মতো

বাংলা দিয়ে কী করব বুঝতে পারি না
অন্যভাষা শিখতে চাই, দক্ষ ও প্রখর

যেন আমি হীরকখনির শ্রমিক,
লাশ হলে সামান্য ক্ষতিপূরণ, আধারকার্ডে ফুটে ওঠা ঝাপসা বানান...

ঢিঁচক্যাও

সাগরিকা নাথ শর্মা

আমার হাহাকার নেই বহুকাল!
বহুকাল কোনও যুদ্ধ নেই, কোনও প্রেম নেই,
কোনও দ্বন্দ্বও নেই তাই!
ব্যাকরণগত জীবনের কিছু
টুংটাং আওয়াজ আছে অবশ্য...

এইসব আওয়াজে গুলিবিদ্ধ হয় পুরুষ, এইসব আওয়াজে লিঙ্গবিদ্ধ হয় নারী, আমি তার মাঝখানে মানুষ হয়ে কার্যনির্বাহী সংজ্ঞা সাজি ভাষার!

নিজেকে প্রতিহত করে রাখার এমন অদম্য বাধ্যতা নিয়ে জন্মেছে খুব কমই কেউ, যার মনের আন্দোলন ভাষার আন্দোলনের চাইতে যাচ্ছেতাই!

শব্দের সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হোক এই নিস্তব্ধ দেহকে!
নিশ্চুপ থেকে যাওয়ার এই অপরাধকে কেউ তো এসে ভুল বলুক! ঢিঁচক্যাও আওয়াজে পুষ্পাঞ্জলি হোক শহিদ মিনারে!

নদীর ভাষা

খোকন সাহা

নদীর ভাষা আছে
এই ভাষা বসন্তকালে শোনা যায়
জল কমে গেলে বালুচরে অক্ষর ছড়ানো হয়
এই এক আলো পরম্পরা
তারপর 'মা' শব্দের জন্ম হয়
নদী মায়ের জন্মভূমি
আমরা সবাই নদীর ভাষায় কথা বলি
নদীর ভাষায় কাঁদি
আজ সব নদী ক্ষীণতোয়া হয়ে গেছে
ভাষা কেড়ে নেয় অন্য কেউ
নদী চিৎকার করে মিছিল থেকে স্লোগান তোলে
'আমার যত্ন নাও মাতৃভাষা বাঁচাও'

পুনঃপাঠ

অপাংশু দেবনাথ

ইদানীং ভুল দরোজার জিঞ্জির ধরে টানি
বেমালুম ভুলে যাই প্রথম দরোজাই আমার...

ক্ষয়িষ্ণু এই জীবনে ঝড়ের মতো অন্ধত্ব আসে,
সময়ের সব পথ বন্ধ হয়ে আসে ভোরের আগেই।

স্বদেশ আমার অমৃতজলে ডুব দিয়ে ওঠে মহাকুম্ভে,
দেখি মুখের ভাষা কেড়ে নেয় কোন বিজাতীয়-মন।

ফিরে যেতে হবে সব অবসাদ রেখে প্রথম দরোজার দিকে,
যেখানে মা আমার ঘরে ঘরে করেন জীবনের পুনঃপাঠ।